বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

৯৩ বর্ষ ২ সংখ্যা মঙ্গলবার ৪ চৈত্র ১৪২০ কলকাতা

প্রার্থী কে

রাহুল গাঁধী আপনাকে প্রাজ্ঞ এবং দক্ষ রাজনীতিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এমন কথা বলা শক্ত। কিন্তু তিনি অন্তত একটি বিষয়ে ঠিক উদ্দেশ্য সাধনে ঠিক পথে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছেন। বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের প্রক্রিয়াটিতে তিনি একটি মৌলিক সংস্কারের উদ্যোগ করিয়াছেন। কোন কেন্দ্রে কে দলের প্রার্থী হইবেন, তাহা স্থির করিবার ব্যাপারে বিভিন্ন দলের অনুসৃত রীতি হুবহু এক হয় না, কিন্তু একটি বিষয়ে কার্যত সমস্ত দলই এক গোত্রের শরিক: শেষ পর্যন্ত নেতারা প্রার্থী বাছিয়া দিয়া থাকেন, বাছাই লইয়া টানাপড়েনের মীমাংসাও উপরমহলের নেতারাই সম্পাদন করেন। কংগ্রেস এই বিষয়ে দৃষ্টিকটু রকমের হাই কমান্ড-নির্ভর। সেই দলের সহ-সভাপতি তথা হাই কমান্ডের অন্যতম প্রধান কর্ণধারের বক্তব্য: প্রার্থী মনোনয়নের প্রক্রিয়াটি গণতান্ত্রিক হওয়া বিধেয়। একটি কেন্দ্রের যোগ্য প্রার্থী কে হইবেন, তাহা স্থির করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের দলীয় সদস্যদের মতামত জানা দরকার, সেই মতামতের ভিত্তিতেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করা উচিত। অর্থাৎ তাঁহার মতে, জনমত যাচাইয়ের মূল নীতিটি দলীয় প্রার্থী নির্ধারণের সময়েও মানিয়া চলা উচিত। তিনি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগের চেষ্টাও করিয়াছেন। সাফল্য নিতান্ত সীমিত। এক দিকে স্থিতাবস্থার প্রবল বাধা আছে, অন্য দিকে প্রার্থী যাচাইয়ের প্রক্রিয়াটিতে নানা ভাবে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ উঠিয়াছে। কিন্তু স্থিতাবস্থা ভাঙিবার অনেক উদ্যোগই প্রথমে নানা বাধার সম্মুখীন হয়। এক অর্থে, এই সব বাধাই প্রমাণ করে, কেন সংস্কার জরুরি।

জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী স্থির করিবার যথাযথ গণতান্ত্রিক উপায় কী, বিভিন্ন দেশেই এই প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা হইয়াছে, হইতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী নির্ধারণের জন্য দুই প্রধান দলই ‘প্রাইমারিজ’ নামক এক দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে। নিজ নিজ শিবিরে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাট প্রার্থীরা উঠিয়া আসেন। রাহুল গাঁধী তাঁহার মডেলটিকে মার্কিন রীতির সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা সংগত নহে, কারণ রাজনৈতিক দল বলিতে এ দেশে যাহা বোঝানো হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাহার অস্তিত্ব নাই, দুই ‘দল’-এর তৎপরতাই নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া সচল হয় এবং কার্যত প্রত্যেক বার নূতন করিয়া সেই সাময়িক ‘দল’ তৈয়ারি হয়। বরং এ ক্ষেত্রে ব্রিটেনের, বিশেষত লেবার পার্টির দৃষ্টান্তটি তুলনায় প্রাসঙ্গিক। বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় এই দলের ‘কনস্টিটিউয়েন্সি কমিটি’ থাকে, আইনসভা বা পুরসভার মতো প্রতিষ্ঠানে দলের স্থানীয় প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তি লইয়া গঠিত সেই কমিটি ভোটে দাঁড়াইতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের উৎকর্ষ, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সম্ভাবনা ইত্যাদি বিচার করিয়া, অনেক সময়েই তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লইয়া যোগ্য প্রার্থী নির্ধারণ করেন। সাধারণত সেই অনুসারেই দল প্রার্থী স্থির করে।

এই পদ্ধতিই হুবহু অনুসরণ করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। কিন্তু উপর হইতে প্রার্থী আরোপ করিবার বদলে স্থানীয় স্তর হইতে প্রার্থী বাছাই করিবার কোনও একটি উপযুক্ত ব্যবস্থায় উত্তরণ অবশ্যই জরুরি। ব্রিটেনের কনজার্ভেটিভ পার্টি ২০১০ নির্বাচন হইতে কিছুটা মার্কিন মডেল অনুসরণ করিয়া ‘ওপেন প্রাইমারিজ’ পদ্ধতিতে প্রার্থী বাছাই চালু করিয়াছে— নির্বাচনের আগে স্থানীয় মানুষ আপন কেন্দ্রের জন্য কোনও দলের সদস্য হিসাবে, বা প্রথমে দল-নিরপেক্ষ ভাবেও, নিজের নাম নথিভুক্ত করিতে পারেন, দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের সময় তাঁহাদের মত শোনা হইবে। পথ অনেক, লক্ষ্য অভিন্ন: গণতন্ত্রকে কী ভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শিরা ও ধমনীতে সঞ্চারিত করা যায়। রাহুল গাঁধী ব্যক্তি হিসাবে সফল না ব্যর্থ, তাহা ভিন্ন প্রশ্ন। তাঁহার চেষ্টাটি অভিনন্দনযোগ্য। অনুসরণযোগ্যও বটে।

ভোট নামক নির্যাতন

ঠান্ডা যুদ্ধের অবসানের পর আর কখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া এত প্রবল ভাবে বিরুদ্ধতায় অবতীর্ণ হইয়াছে কি? প্রশ্নটি আলংকারিক। স্বাধীন দেশ ইউক্রেনের অংশবিশেষ ক্রাইমিয়ায় যে ভাবে রাশিয়ার ব্যবস্থাপনায়, রুশ সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে গণভোট আয়োজিত হইল, এবং তথাকথিত পঁচানব্বই শতাংশ ক্রাইমিয়ান মানুষের অংশগ্রহণে নির্ধারিত হইল যে তাঁহাদের বাসস্থান অতঃপর রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল: ওয়াশিংটনের মতে তাহা আন্তর্জাতিক বিধির সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। গণভোটের আগেই মস্কোর উদ্দেশ্যে যুগপৎ মার্কিন ও ইউরোপীয় হুমকি বর্ষিত হইতেছিল যে এই ঘটনার ফল রাশিয়ার জন্য ভাল হইবে না। অবিচলিত রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হইয়াছেন, চতুর্দিকে বন্দুক-বেষ্টনীর মাঝে ক্রাইমিয়ার মানুষের সারে সারে ভোট দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রচার-ক্যামেরার সামনে মানুষগুলি হাস্যোজ্জ্বল মুখে ঘোষণা করিয়াছেন: এত দিনে তাঁহারা ‘গৃহ’ পাইলেন, মস্কো নামক গৃহ। সোভিয়েত সাম্রাজ্য ভাঙিয়া খণ্ডবিখণ্ড হইবার পর সমগ্র বলকান অঞ্চলে অনিশ্চিতি ও পরস্পর-বিরুদ্ধ আবেগের ছড়াছড়ি। এক দিকে নূতন ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দিয়া মুক্ত অর্থনীতি ও সমাজের সুবাস গ্রহণের ঐকান্তিক আগ্রহ, অন্য দিকে রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘ ঐতিহাসিক বন্ধনের অভ্যাস: এই দুইয়ের টানাপড়েনের সুযোগ লইয়া রাশিয়ার তথা নিজের ক্ষমতা প্রসারের কাজে পুতিন কোনও কালেই দ্বিধান্বিত ছিলেন না। ২০০৮ সালে জর্জিয়ার ক্ষেত্রেও তাঁহাকে একই পদক্ষেপ লইতে দেখা গিয়াছিল। তবে, সমস্ত পূর্ব-দৃষ্টান্ত ছাপাইয়া ইউক্রেনের কাছ হইতে এ বার ক্রাইমিয়াকে ছিনাইয়া লইবার যে কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিলেন তিনি, তাহা অভূতপূর্ব।

ইউক্রেন অতঃপর যুদ্ধে যাইতে চাহে। তাহাকে যদি নিরস্ত করা না যায়, কিংবা রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে ইউক্রেন হইতে সরানো না যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ কী, ইহাই আপাতত কোটি ডলারের প্রশ্ন। মস্কোর অস্ত্র/সৈন্য সম্ভারের তুলনায় কিয়েভ নেহাতই ‘চুনো’। সুতরাং সংঘর্ষ হইলে নামে বা বেনামে মার্কিন ও ইউরোপীয় বাহিনীর সহিতই মস্কোকে লড়িতে হইবে। সেই প্রলয়-সম্ভাবনা যে কোনও পথে পরিহার্য। অন্য দিকে, ২০১৪ সালের ইউক্রেন-পর্ব যদি ২০০৮ সালের জর্জিয়া-পর্বের মতো বেমালুম হজম করিতে হয়, তবে পুতিনই একবিংশ শতকের ঈশ্বর প্রতিপন্ন হইবেন: পশ্চিমি দেশগুলির পক্ষে সে কাজও সহজ নয়।

ই ইউ-এর প্রধান জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামা তাই চুল চিরিয়া হিসাব করিতেছেন, ঠিক কোন হুমকিটি পুতিনের পক্ষে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া কঠিন হইতে পারে। নেটো-র বৈঠকে রাশিয়াকে না ডাকিবার ভয়? পুতিনের বঙ্কিম হাসি ছাড়া কিছু মিলিবে না, কেননা নেটো-বৈঠকে যতই হম্বি-তম্বি হউক, রাষ্ট্রপুঞ্জের দৌলতে গুরুতর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রগুলিতে রাশিয়ার মত ছাড়া পশ্চিমি শিবির এক পা-ও নড়িতে অক্ষম। বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা? রাশিয়ার তাহাতে তেমন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। তবে কূটনীতির কোন প্যাঁচে পুতিন শায়েস্তা হইবেন? অবস্থাগতিকে পুতিনের এই অপ্রতিহত ক্ষমতান্ধতার শিকার কেবল অসংখ্য বলকান নাগরিক, যাঁহাদের নিকট গণভোটও আসলে নির্যাতনেরই নামান্তর।

ইউপিএ ২-ও এনডিএ-র তুলনায় বেশি সফল

মৈত্রীশ ঘটক ও অমিতাভ গুপ্ত

বহু কারণে মনমোহন সিংহের সরকারের সমালোচনা করা যায়। কিন্তু তাঁর আমলে আর্থিক বৃদ্ধির হার মুখ থুবড়ে পড়েছে, এমন দাবি করার উপায় নেই। দুনিয়াজোড়া আর্থিক মন্দার ধাক্কা সামলেও এই আমলে আয়বৃদ্ধির গড় হার পূর্বসূরি এনডিএ-র তুলনায় বেশি।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের লড়াই কোন প্রশ্নকে ঘিরে হবে, তা নিয়ে বহু জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। বিজেপি যখন নরেন্দ্র মোদীকেই তাদের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করল, তখন অনেকেই ঘাড় নেড়ে রায় দিয়েছিলেন, লড়াই তবে ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির। দেখা গেল, বিজেপি-র প্রচারে হিন্দুত্বের প্রসঙ্গ তেমন ভাবে এলই না। বরং, তর্কের কেন্দ্রে এসে দাঁড়াচ্ছে অর্থনীতি।

প্রচার বনাম বাস্তব

উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি, বিনিয়োগের মতো প্রশ্ন যদি রাজনীতির কেন্দ্রে ঠাঁই পায়, গণতন্ত্রের পক্ষে তার চেয়ে ভাল আর কী-ই বা হতে পারে? মুশকিল হল, অর্থনীতির আলোচনার কেন্দ্রে থাকে সংখ্যা। এখানে এসেই ধাক্কা খেতে হয়। ভারতে অর্থনীতি নিয়ে বিজেপির, বস্তুত মোদীর, যে প্রচার চলছে— তার মধ্যে, কী আশ্চর্য, সংখ্যা নেই! আছে কতগুলো মতামত। দুই গোত্রের মতামত। প্রথম, মোদী তাঁর শাসনকালে গুজরাতে অর্থনৈতিক যাদু দেখিয়েছেন; এবং দ্বিতীয়, ইউপিএ ভারতীয় অর্থনীতিকে তলানিতে নিয়ে গিয়েছে। আয়বৃদ্ধির হার ধাক্কা খেয়েছে, বিদেশি বিনিয়োগ তলানিতে এসে ঠেকেছে, দুর্নীতির প্রাবল্যে দেশে বিনিয়োগের পরিবেশ নষ্ট হয়েছে।

গণতন্ত্রে এক দল বেশি দিন সরকারে থাকলে নানা বিক্ষোভ জমা হবে, এবং ভোটাররা পরিবর্তন চাইবেন, এটা স্বাভাবিক, এমনকী কাম্যও। যে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রচারে নিজেদের গুণগান এবং প্রতিপক্ষের নিন্দা থাকবে, তা-ও স্বাভাবিক। কিন্তু, সেই গুণগান এবং নিন্দার যুক্তি যদি অর্থনীতির হয়, এবং তার পিছনে যদি পরিসংখ্যানের সমর্থন না থাকে, তা হলে খুব মুশকিল। তখন আর সেটা অর্থনীতির লড়াই থাকে না, নিছক বিজ্ঞাপনের গল্প হয়ে দাঁড়ায়।

মোদীর আমলে গুজরাতের অবিশ্বাস্য উন্নয়ন নিয়ে যে গুজবটা বাজারে চলছে, তা যে পরিসংখ্যানের কষ্ঠিপাথরে উতরোয় না, সেই আলোচনা অন্য একটি লেখায় করব। এই লেখায় অন্য গুজবটা, অর্থাৎ ইউপিএ-র ‘অর্থনৈতিক ব্যর্থতা’-কে পরিসংখ্যানের আলোয় পরীক্ষা করে দেখব। ইউপিএ সরকারকে গাল দেওয়ার হাজারটা কারণ আছে। কিন্তু সেই তালিকায় আর্থিক বৃদ্ধি নেই। এই আমলে আর্থিক বৃদ্ধির ছবিটা ঠিক কী, সেটাই এই লেখায় বোঝার চেষ্টা করব।

সত্যিই গত দুই বছরে ভারতে আয়বৃদ্ধির হার ধাক্কা খেয়েছে। ২০১২ সালে ভারতে জাতীয় আয় বেড়েছিল ৩.২৪ শতাংশ হারে, ২০১৩ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩.৮ শতাংশে। কিন্তু, এই দু’বছরের আয়বৃদ্ধির হার কতটা খারাপ, সেটা বোঝার মাপকাঠি কী? আগের কয়েক বছরের সঙ্গে তুলনা করে দেখা যাক। ২০১০ সালে, গোটা দুনিয়া যখন আর্থিক মন্দার প্রকোপে কাঁপছিল, সে বছর ভারতে জাতীয় আয় বেড়েছিল ১০.৫৫ শতাংশ হারে। সে বছর চিনে এই হার ছিল ১০.৪৫ শতাংশ, ভারতের চেয়ে সামান্য কম। তার আগের বছর, গোটা দুনিয়ার অর্থনীতি যেখানে হ্রাস পেয়েছিল, ভারতে জাতীয় আয় বেড়েছিল ৮.৪৮ শতাংশ হারে। এই অঙ্কগুলির পাশে ফেলে দেখলে গত দু’বছরের আয়বৃদ্ধির হার সত্যিই কম।

কিন্তু, দুটো কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, আর্থিক মন্দা সব দেশের অর্থনীতিকেই কাবু করেছে। ২০১২ এবং ২০১৩ সালের আয়বৃদ্ধির হারকে এই প্রেক্ষিতে দেখা প্রয়োজন। এই দু’বছরে চিনেও আয়বৃদ্ধির হার অনেকখানিক কমেছে। দ্বিতীয়ত, দশ বছর ধরে যে সরকার ক্ষমতায় থেকেছে, তার বিচার শেষ দু’বছরের পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভর করে হতে পারে না। ২০০৪ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ভারতে যে হারে মাথাপিছু জাতীয় আয় বেড়েছে, তা চিন বাদে দুনিয়ার আর কোনও দেশে কখনও হয়নি। ২০০৫ থেকে ২০০৭, পর পর তিন বছর এই হার নয় শতাংশের বেশি ছিল। এই তিন বছরে গোটা দুনিয়ায় মাথাপিছু জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার পাঁচ শতাংশের ধারেকাছে ছিল। অর্থাৎ, গোটা দুনিয়ায় আর্থিক অবস্থা যেমনই থাকুক, ইউপিএ-র আমলে ভারত তার তুলনায় এগিয়ে ছিল।

পরিসংখ্যান যাঁদের পক্ষে। পালনিয়াপ্পন চিদম্বরম, মনমোহন সিংহ ও সনিয়া গাঁধী। ***ছবি:** রমাকান্ত কুশওয়াহা*

বিভিন্ন সরকারের আমলে ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির হার (শতাংশ)

	প্রাক্-এনডিএ ১৯৯১-১৯৯৭	এনডিএ ১৯৯৮-২০০৩	প্রথম ইউপিএ ২০০৪-২০০৯	দ্বিতীয় ইউপিএ ২০০৯-২০১২
আর্থিক বৃদ্ধির হার				
ভারত	**৫.৩১**	**৫.৮৩**	**৮.০২**	**৬.৪৮**
বিশ্ব	৩.০৬	৩.৩১	৪.৬০	২.৯৫
চিন	১১.৯৩	৮.৫৫	১১.৫৮	৮.৮৫
বিশ্বের গড় বৃদ্ধির হারের সঙ্গে পার্থক্য				
ভারত	**২.২৫**	**২.৫২**	**৩.৪২**	**৩.৫৩**
চিন	৮.৪৭	৫.২৪	৬.৯৭	৫.৯০

গত কুড়ি বছরে সেরা

কোনও সরকারের শাসনকালের সম্পূর্ণ সময় জুড়ে অর্থনীতির কী অবস্থা ছিল, সেটা সরকারের কৃতিত্বের বা ব্যর্থতার একটা বড় মাপকাঠি। ১৯৯১ সালে ভারত উদার অর্থনীতির পথে হাঁটতে আরম্ভ করে। কাজেই, সেই বছরটাকে একটা নতুন পর্বের সূচনা হিসেবে দেখা যেতেই পারে। এই নতুন পর্বে ভারত মোট চারটি সরকারের শাসন দেখেছে (১৯৯৬ সালে বিজেপি-র ১৩ দিনের সরকারটিকে বাদ দিয়ে)।

সঙ্গের সারণি থেকে পরিষ্কার, আয়বৃদ্ধিতে সবচেয়ে সফল প্রথম দফার ইউপিএ সরকার। এই তথ্যে অবশ্য অবাক হওয়ার তেমন কারণ নেই। ২০০৮ এর বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হবার আগে ভারত ও চিনের আজব বৃদ্ধির তাজ্জব গল্প সারা পৃথিবী জানে। অবাক হওয়ার মতো তথ্য হল, ইউপিএ-র দ্বিতীয় দফাতেও গড় আয়বৃদ্ধির হার এনডিএ-র তুলনায় অনেকটাই বেশি। এই তথ্যটিতে এসে একটু থমকে দাঁড়ানো ভাল। যে আমলে অর্থনীতির গতিভঙ্গের কথা বলেই নরেন্দ্র মোদী তাঁর প্রচারের সুর তারসপ্তকে বেঁধেছেন, সেই আমলেও ইউপিএ তার প্রতিপক্ষ এনডিএ-র তুলনায় ভাল অবস্থায় আছে! বস্তুত, ১৯৯৮ সালে এনডিএ ক্ষমতায় আসার আগে যে দু’টি সরকার ভারত শাসন করেছিল, সেই আমলেও বাৎসরিক আয়বৃদ্ধির হার এনডিএ-র তুলনায় খুব কম নয়। ১৯৯২ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতি বছরে গড়ে ৬.০১ শতাংশ হারে বেড়েছে, আর ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বেড়েছে ৫.৮৩ শতাংশ হারে। নরেন্দ্র মোদীর প্রচারযন্ত্রের কল্যাণে যাঁরা বিশ্বাস করে ফেলেছেন যে ইউপিএ সরকারই আর্থিক বৃদ্ধির মতো অতি জরুরি একটা জিনিসের সর্বনাশ করেছে, তাঁরা আর এক বার ভেবে দেখুন।

মন্দার প্রভাব বাদ রাখলে

এত তুলনার পরেও কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, দেশের অর্থনীতির চলন কি আর শুধু দেশের কারণগুলোর ওপরই নির্ভর করে? আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা ভুলে গেলে চলবে? প্রশ্নটা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়ার নয়। এনডিএ আর ইউপিএ-র তুলনা যদি সত্যিই করতে হয়, তবে আন্তর্জাতিক প্রভাবগুলোকে ছেঁটে ফেলে করতে হবে। সেই তুলনা করার একটা মান্য পদ্ধতি আছে। ভারতের আয়বৃদ্ধির হার থেকে যদি গোটা দুনিয়ার গড় আয়বৃদ্ধির হারকে বিয়োগ করে দেওয়া হয়, তবে আন্তর্জাতিক প্রভাবকে ছেঁটে ফেলা যায়। কারণ, যে আন্তর্জাতিক ঘটনাক্রম ভারতে প্রভাব ফেলছে, সেটা বাকি দেশগুলোতেও প্রভাব ফেলছে, ফলে দুনিয়ার গড়ে সেই প্রভাব আছে। সেটা বাদ দিলে যা পড়ে থাকে, ভালো হোক আর মন্দ, সেই অংশটুকু নিতান্তই ভারতের। এ বার যদি সারণির দ্বিতীয় অংশের দিকে তাকান, তবে ভারত আর চিনের যে হারগুলো দেখতে পাবেন, তা এই ‘নিজস্ব আয়বৃদ্ধির হার’।

এই হিসেবেও দেখা যাচ্ছে, ইউপিএ-র তুলনায় এনডিএ-র অবস্থা খারাপ। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক প্রভাব ছেঁটে ফেলার পর, শুধু সরকারের ক্ষমতায় যেটুকু আয়বৃদ্ধি হয়েছে, তাতেও এনডিএ পিছিয়ে আছে। কিন্তু, আসল বিস্ময়ের কারণ অন্যত্র— এই দৌড়ে ফার্স্ট ইউপিএ এক নয়, ইউপিএ দুই। ইউপিএ একের সঙ্গে দুইয়ের ফারাক পরিসংখ্যানগত ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয় বটে, কিন্তু এটাও অনস্বীকার্য যে বিজ্ঞাপনী প্রচার যাকে ক্লাসের লাস্ট বয় হিসেবে দেগে দিয়েছে, দেখা যাচ্ছে, সেই আমলেই ভারতের অর্থনীতি নিজের জোরে সবচেয়ে ভাল করেছিল। কিন্তু এই আমলেই আর্থিক মন্দার সুনামি আছড়ে পড়েছিল ভারতের ওপর, ফলে নিজের জোরে ইউপিএ দুই যতটুকু করতে পেরেছিল, মন্দা তার অনেকটাই নষ্ট করে দিল।

আয়বৃদ্ধিতে সবচেয়ে সফল প্রথম দফার ইউপিএ সরকার। ইউপিএ-র দ্বিতীয় দফাতেও গড় আয়বৃদ্ধির হার এনডিএ-র তুলনায় অনেকটাই বেশি।

এ বার চিনের পরিসংখ্যানের দিকে তাকাই। যে ২০ বছরের পরিসংখ্যান নিয়ে চর্চা করছি, সেই গোটা সময়কাল জুড়েই চিন ভারতের চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু, একমাত্র ২০০৯-২০১২ সময়কালে, অর্থাৎ ভারতে যখন ইউপিএ-র দ্বিতীয় দফার শাসন চলছে, তখনই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। তার আগের সময়কালের তুলনায় ভারতে যখন গড় আয়বৃদ্ধির হার বাড়ল, চিনে তখন কমল। অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে সরিয়ে রাখলে ভারত এই সময়ে তুলনামূলক ভাবে চিনের চেয়ে ইতিবাচক অবস্থায় ছিল।

বিনিয়োগ, পরিকাঠামো

আয়বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদেশি বিনিয়োগের হার কমে যাওয়া নিয়েও জোর প্রচার চলেছে। সেখানে ছবিটা কী রকম? পর পর দু’বছর বিনিয়োগের পরিমাণ অনেকখানি কমার পর এনডিএ-র শেষ বছরে, ২০০৩-০৪ সালে, ভারতে মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের অঙ্কটি ছিল ২২২.৯ কোটি ডলার। সেখানে, ২০১১-১২ সালে ভারতে মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ এসেছিল ৪,৬৫৫.৩ কোটি ডলার। ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৭ সালে, আর্থিক মন্দা আরম্ভ হওয়ার অব্যবহিত আগে, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে ভারত গোটা দুনিয়ায় ৩৫তম স্থানে ছিল। আর মন্দা যখন একেবারে চরমে, সেই ২০১০ সালে ভারত উঠে এসেছিল ২৩তম স্থানে। কাজেই, বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ইউপিএ সরকারের ওপর যথেষ্ট আস্থা রেখেছেন বলেই দেখা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন— ইউপিএ-র আমলে শেয়ার বাজারে বিদেশি বিনিয়োগের তুলনায় শিল্পে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে অনেক বেশি।

প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ কোন খাতে এসেছে, সেটাও একটা প্রশ্ন। সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ এসেছে নির্মাণ ক্ষেত্রে, যাকে অর্থনীতির ভিত্তিপ্রস্তর বললে ভুল বলা হবে না। ২০০৮-০৯ সালে মোট প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের ২১ শতাংশ এসেছিল এই খাতে। প্রতি বছর অনুপাতটি বেড়েছে। ২০১১-১২ সালে তা প্রায় ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল। পরের বছর তা হয়েছে ৩৬ শতাংশ।

পরিকাঠামো খাতেও বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে। ২০০২-০৩ এবং ২০০৩-০৪ সালে, অর্থাৎ এনডিএ-র শেষ পর্যায়ে এই খাতে দেশের জাতীয় আয়ের ৪.৭৭ এবং ৪.৭৬ শতাংশ বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ইউপিএ-র আমলে বিনিয়োগের পরিমাণ বেড়েছে। ২০১০-১১ সালে অঙ্কটি দাঁড়িয়েছিল জাতীয় আয়ের ৮.৪১ শতাংশে। ২০১১-১২ সালে এই হার খানিক কমে ৬.৯৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। লক্ষণীয়, কমার পরেও বিনিয়োগের অনুপাত এনডিএ-র আমলের তুলনায় ঢের বেশি।

মোদ্দা কথা হল, ইউপিএ-র আমলের ফলাফল এনডিএ-র তুলনায় ভাল। তবে, অর্থনীতির স্বাস্থ্যভঙ্গের কিছু ইঙ্গিতও যে পাওয়া যাচ্ছে, তা-ও আমরা উল্লেখ করেছি। দুর্নীতির মতো অন্য সমস্যাও আছে। কোন চিকিৎসকের হাতে পড়লে অর্থনীতির স্বাস্থ্য ফিরবে, সেটা অন্য প্রশ্ন। কিন্তু প্রচারের চটকে বিভ্রান্ত হয়ে চটজলদি টোটকার ওপর ভরসা না করাই ভাল। অর্থনীতির স্বাস্থ্য নিয়ে তুমুল তর্ক চলুক, কিন্তু প্রকৃত পরিসংখ্যানের নিরিখে।

মৈত্রীশ ঘটক লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ অর্থনীতির অধ্যাপক।

শুধু কয়লা আর তেলের ভরসায় থাকাটা বোকামি

কুন্তক চট্টোপাধ্যায়

চড়া রোদ, জোর হাওয়া বা এমন নানা অপ্রচলিত প্রাকৃতিক উৎস থেকে অনেকটা বিদ্যুৎ আমরা তৈরি করতে পারি, কিন্তু করছি না। করা দরকার। পরিবেশের জন্য, অর্থনীতির স্বার্থেও।

ঘরে ইনভার্টার না বসিয়ে ছাদে সৌরকোষ বসিয়েছিলেন দেবাশিস মিত্র। তাতে বাড়ির পুরো বিদ্যুৎ অবশ্য জোটে না। কিন্তু লোডশেডিংয়ের সময় দু’টো লাইট, একটা ফ্যানের দিব্যি সংস্থান হয়ে যায়। কখনও কখনও কেনা বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিব্যি নিজের তৈরি বিদ্যুৎ দিয়েও সন্ধেটা কাটিয়ে দেন মিত্র-গিন্নি! মাসের শেষে দেখা যায় বিদ্যুতের বিল অনেকটাই কম এসেছে।

ছবিটা একটা বাড়ির নয়। আবার এটা কিছু বাড়ির দৃষ্টান্তমাত্র নয়। এটা একটা সম্ভাবনা। দেশ জুড়ে অপ্রচলিত শক্তির (রিনিউয়েবল এনার্জি বা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি) ব্যবহার নিয়ে যে ধন্দটা রয়েছে, মিত্র বাড়ির মডেলটা তার চমৎকার একটা সমাধান দিতে পারে। ভারতে অপ্রচলিত শক্তির যে উৎস রয়েছে, তাতে গোটা দেশের শক্তির জোগান না হোক, ‘সাপোর্টিং স্টাফ’-এর ভূমিকাটা নিতেই পারে। সেখানেই সম্ভাবনা।

২০১১-২০১৭ সালের পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রক জানিয়েছে, বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে অপ্রচলিত উৎসগুলো ক্রমশ বড় ভূমিকা নিচ্ছে। এ ব্যাপারে অন্য দেশ থেকে শেখার আছে। জার্মানির মোট বিদ্যুতের ২১ শতাংশ আসে অপ্রচলিত উৎস থেকে। ২০২০ সালের মধ্যে সেটি ৩৫ শতাংশে নিয়ে যেতে চায় তারা। এ দেশে গুজরাত, রাজস্থানও অপ্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদনে এগিয়ে রয়েছে। তবে অপ্রচলিত শক্তি জিনিসটা মূলত কথায় কিংবা সেমিনারেই আটকে থাকবে কি না সে প্রশ্নও উঠেছে। তার কারণ, বাস্তবে এই বিদ্যুতের প্রয়োগ অত্যন্ত কম।

পরিবেশবিদেরা বলছেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু বদলের প্রেক্ষিতে এই অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বিশ্বের সব দেশেই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন মার্কিন পরিবেশবিজ্ঞানী ডেভিড ওয়াস্কো। তাঁর মতে, বিশ্ব জুড়ে জলবায়ু বদলের নানা ইঙ্গিত মিলছে। ইঙ্গিত মিলছে তার ভয়াবহ পরিণতিরও। এই পরিণতি রুখতে গেলে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। কারণ, এই শক্তি উৎপাদনের ফলে কোনও দূষণ ছড়ায় না। বস্তুত, এ দেশে অপ্রচলিত শক্তির উৎসও প্রচুর।

শুধু পরিবেশ নয়, অর্থনীতির যুক্তিও গুরুত্বপূর্ণ। সারা বিশ্বেই তেল-কয়লা-গ্যাসের ভাণ্ডার ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। তার ফলে ওই সব জ্বালানির দামও উত্তরোত্তর বাড়ছে। বাড়ছে বিদ্যুতের খরচও। সেই হিসেবে আগামী দিনে এই পরিস্থিতিতে সবুজ জ্বালানি কিংবা অপ্রচলিত শক্তির দাম তুলনামূলক ভাবে কমবে। কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক (অপ্রচলিত শক্তি) একটি রিপোর্টে বলছে, বায়োগ্যাস যদি সিলিন্ডারে ভরে ব্যবহার করা যায়, তা হলে এলপিজি কিংবা সিএনজি-র মতোই কাজ করবে। মিড ডে মিল কিংবা গৃহস্থ বাড়িতে রান্নার কাজেও এই সিলিন্ডার অনায়াসে ব্যবহার করা যেতে পারে।

দেশের সব রাজ্যে এখনও অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার সে ভাবে বেড়ে ওঠেনি। দেশে মোট উৎপন্ন বিদ্যুতের ১৩ শতাংশ অপ্রচলিত উৎস থেকে আসার পরিস্থিতি রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মিলছে মাত্র ৭ শতাংশ। কেন্দ্রীয় অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রক এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ২০১৭ সালের মধ্যে অপ্রচলিত উৎস থেকে বছরে অন্তত ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে।

অপ্রচলিত শক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই লক্ষ্য পূরণ করতে গেলে প্রয়োজন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং নীতি প্রণয়ন। সেটা যেমন শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে, তেমনই এই শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর প্রচেষ্টাতেও। পরিবেশবিদেরা বলেন, এ দেশে যে অপ্রচলিত শক্তির ব্যবহার বাড়ছে না, তার অন্যতম কারণ অপ্রচলিত শক্তির জনপ্রিয়তা বাড়ানোর তেমন কোনও প্রয়াস সরকারি কিংবা বেসরকারি তরফে নেওয়া হয়নি।

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী, এ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন রকমের অপ্রচলিত শক্তির উৎস রয়েছে। যেমন, তামিলনাড়ুতে হাওয়ার জোর অনেক বেশি। সেখানে হাওয়া-কল বসিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা যেতে পারে। আবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে যেখানে অনেক বেশি রোদ মেলে, সেখানে সৌরবিদ্যুৎ তৈরি অনেক সহজ। এই মতের সমর্থনে ডেভিড ওয়াস্কোর মন্তব্য, “অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহার করে ভারতের মতো কোনও দেশে সামগ্রিক বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। ফলে এখানে আঞ্চলিক ভাবে অপ্রচলিত শক্তির উৎসের পরিকল্পনা করতে হবে।”

অ-বাস্তব নয়। বইমেলা, কলকাতা, ২০১১। ***ছবি:** সনৎকুমার সিংহ*

কেন্দ্রীয় অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রক এ ব্যাপারে ভাবনাচিন্তাও শুরু করেছে। মন্ত্রকের বিশেষজ্ঞ শান্তিপদ গণচৌধুরী বলছেন, পূর্ব ভারত ও পশ্চিম ভারতের ক্ষেত্রে অপ্রচলিত শক্তি নীতি যে এক হতে পারে না, এটা এত দিন বুঝতে চাইতেন না দেশের সরকারি কর্তারা। তাই আঞ্চলিক ভাবে উৎসের পরিকল্পনা করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার পরিকল্পনায় ঘাটতি ছিল। কিন্তু তা এ বার শুধরে নেওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে আর্থিক দিকেও। উন্নত দেশগুলিতে ছোট কেন্দ্রে কিংবা গৃহস্থ বাড়িতে অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের যন্ত্র বসানোর জন্য ব্যাঙ্কগুলি সহজ শর্তে ঋণ দেয়। এ দেশে দীর্ঘদিন ধরে ব্যাঙ্কগুলি এ ক্ষেত্রে উৎসাহ দেখায়নি। কিন্তু দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ব্যাঙ্কগুলিকে এই ক্ষেত্রে সহজ শর্তে ঋণ মঞ্জুরির পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ‘এখন প্রচুর গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সৌর বিদ্যুতের যন্ত্রাংশ বসাতে সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে’, বললেন শান্তিপদবাবু।

কিন্তু শুধু কেন্দ্রীয় স্তরে পরিকল্পনা করে অপ্রচলিত বিদ্যুতের ভাণ্ডার গড়ে তোলা যাবে না। দরকার রাজ্য স্তরেও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা। দেশের মধ্যে অপ্রচলিত উৎস থেকে শক্তি উৎপাদনে গুজরাত, রাজস্থান, তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যগুলি এগিয়ে গিয়েছে। দেশের মধ্যে পথিকৃৎ হয়েও পিছিয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ। গত বছর পাঁচেকের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে পিছনে ফেলেছে ঝাড়খণ্ড, ছত্তীসগঢ়ের মতো রাজ্যও।

এ রাজ্যের অপ্রচলিত শক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে সমস্যাটা নীতি নির্ধারণের। শান্তিপদবাবু বলছেন, ‘এ রাজ্য থেকে সৌরশক্তির প্রযুক্তি শিখল গুজরাত। তার পরেই নরেন্দ্র মোদী রাজ্যে সৌরশক্তি ছড়িয়ে দেওয়া নিয়ে প্রকল্প ঘোষণা করলেন।’ কিন্তু এ রাজ্যে প্রথম সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়েও তা ছড়াতে পারেনি। যেমন, কলকাতা পুর এলাকায় বহুতলে সৌর-কোষ বসানোর নিয়ম থাকলেও তা লাগু করা হয়নি। তা নিয়ে হাইকোর্টে মামলাও হয়েছে।

অথচ, ভৌগোলিক দিক থেকে এ রাজ্যে অপ্রচলিত শক্তির উৎস প্রচুর। সৌর শক্তি তো রয়েইছে, সুন্দরবনে হাওয়া-কল কিংবা জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। উত্তরবঙ্গে ছোট মাপের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়া যেতে পারে। রাজ্যে নগরায়ণ বাড়ছে। বাড়ছে পুর এলাকাও। ফলে পুর এলাকার আবর্জনাও কাজে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু এই কাজে লাগানোর পরিকল্পনাতেই একটা ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

শান্তিপদবাবু অবশ্য মনে করেন, অপ্রচলিত বিদ্যুৎ তৈরির ক্ষেত্রে বড় পরিকাঠামোর প্রয়োজন নেই। নিয়ম মেনে শহরে বহুতলগুলির ছাদে সৌরশক্তি বসানোর নীতি কঠোর ভাবে রূপায়ণ করলেই অনেকটা কাজ হতে পারে। শান্তিপদবাবু বলছেন, ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কেনার পরে ২ লক্ষ টাকা খরচ করে সৌরকোষ বসালেই গেরস্থালি কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুতের প্রায় ৮০ শতাংশ সৌরশক্তি থেকে মিলতে পারে।

কিন্তু অপ্রচলিত শক্তি নিয়ে অনেকের মনে নানা প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষ করে, সূর্যের আলো কিংবা হাওয়ার মতো প্রাকৃতিক সম্পদ বছরভর মেলে না। তাই অপ্রচলিত শক্তির বিদ্যুৎও সব সময় সমান ভাবে না-ও মিলতে পারে। এ কথা কিছুটা হলেও যে সত্যি, তা মেনে নিচ্ছেন অপ্রচলিত শক্তি বিশেষজ্ঞরা। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক অরিন্দমকুমার শীল বলছেন, এ সমস্যা এড়াতে ‘হাইব্রিড’ মডেল ব্যবহার করা যেতে পারে। সেটা কী রকম?

অরিন্দমবাবু জানিয়েছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাদেই এমন একটি মডেল বসানো রয়েছে। তাতে সৌর কোষ যেমন রয়েছে, তেমনই হাওয়া-কলও রয়েছে। তাঁর ব্যাখ্যা, গরম কালে এবং শীতের কিছু কিছু সময়ে রোদের তেজ বেশি থাকে। ফলে সে সময় সৌরশক্তির উপযুক্ত অবস্থা থাকে। বর্ষাকালে সৌরশক্তির উপযোগী রোদ থাকে না। কিন্তু জোরালো হাওয়া থাকায় হাওয়া-কল থেকে বিদ্যুৎ তৈরি হতে পারে। তবে এটা তুলনায় ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু খরচ করেও যাঁরা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে চান, তাঁরা এই ব্যবস্থা নিতেই পারেন।

অর্থাৎ উৎস রয়েছে, পদ্ধতি রয়েছে, রয়েছে সুযোগও। প্রয়োজন শুধু নীতি-পরিকল্পনার।